গোপাল হালদার : গল্পকার

সুমিতা চক্রবর্তী

গোপাল হালদার শিক্ষিত এবং সময়-সচেতন বাঙালি পাঠকের কাছে খুবই পরিচিত নাম। বহুদিকে বিকীর্ণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আভা। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যে-সংযোগ ছিল তার ব্যপ্তি ও সততা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু তা মনে রাখতে হবে কারণ সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত ভাষাশিল্পীর চিত্তলোকের প্রতিটি দিকই প্রত্যক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন থাকে। যা আপাত প্রচ্ছন্ন থাকে সংবেদী পাঠক তাকে অনুভব করতে পারেন বলেই সেই লেখক হয়ে ওঠেন হয়তো বা কম পঠিত কিন্তু কালোত্তীর্ণ।

গোপাল হালদারের প্রতিভা ও মনীষা যেমন তাঁর কর্মজীবনে উদ্ভাসিত, তেমনই তাঁর লিখনচর্চার মধ্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকা অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায় বলে তার পুনরুক্তি করছি না। বলে নেওয়া যায় যে, তিনি লিখেছেন উপন্যাস, ছোটোগল্প, রসনিবন্ধ, গবেষণা-নির্ভর বহু প্রবন্ধ বাংলায় ও ইংরেজিতে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-সংকলন আছে তাঁর। তিনি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি ও রুশ সাহিত্যের ইতিহাস লিখে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের। গোপাল হালদার ভাষাতত্ত্ববিদ রূপেও উল্লেখযোগ্য। জীবনী লিখেছেন বেশ কয়েকটি, লিখেছেন বিস্তৃত আত্মজীবনী। সম্পাদনা করেছেন বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তাঁর গ্রন্থতালিকা যতটা আমাদের জানা, তাঁর লেখা ততটা আমাদের পঠিত নয়। গবেষক-পাঠকেরা অবশ্যই পড়েছেন কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সত্যিই তিনি খুব বেশি পৌঁছোতে পারেননি। তার একাধিক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য রচনা করবার কথা তাঁর কল্পনাতেও আসেনি কোনোদিন। তিনি লিখতেন নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যই।

গোপাল হালদারের কথাসাহিত্যের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত তাঁর দুটি ত্রি-পর্ব উপন্যাস—'একদা'-'অন্যদিন'-'আর একদিন' এবং 'পঞ্চাশের পথ'-'তেরোশ-পঞ্চাশ'-'ঊনপঞ্চাশী'। কিন্তু তাঁর ছোটোগল্প রচিত হবার সমকালে নিশ্চই পঠিত হয়েছিল, এখন দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বহুদিন আর সেগুলি সাধারণ পাঠকের করায়ত্ত নয়। এই নিবন্ধে গোপাল হালদারের ছোটোগল্পের পরিচয়টুকু তুলে ধরতে চাই।

একটি-ই মাত্র গল্প-সংকলন, একবার-ই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, অত্যন্ত বিনীত এক শিরোনাম সহ—'ধূলিকণা'। প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রোগ্রেসিভ ফোরাম' থেকে। ঠিকানা ২৪/৩-এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ১২। সেই সঙ্গে প্রদত্ত ছিল আরও তথ্য 'কলিগ্রাম লাইব্রেরী (মালদহ)/হইতে সুশীল বিশ্বাস/কর্ত্তৃক প্রকাশিত'। বইটির মুদ্রক ছিলেন শ্রীফণিভূষণ হাজরা

এবং তাঁর ঠিকানা ছিল 'গুপ্ত প্রেস/৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন,/কলিকাতা'। বইটির প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন মণীন্দ্র মিত্র; দাম ছিল দু-টাকা। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ। এই গেল বইটির অবয়বের পরিচিতি। ছোটো একটি ভূমিকা ছিল প্রারম্ভে। পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি সবটাই—

ভূমিকা

এক কালে যে আমি গল্প লিখতাম, সে কথা অমিই ভুলে গিয়েছিলাম। এ সংগ্রহের প্রায়গুলো গল্পই অনেক পুরানো; দু'একটি ছাড়া অন্যগুলো বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার লেখা। এখন পড়লে মনে হয়— মাঝখানে অনেকটা পথ পড়ে রয়েছে, কথাবস্তুর দিক থেকেও কথা-কলার দিক থেকেও। পিছনকার পথের এই ধূলিকণা হয়ত ঝেড়ে ফেল্‌বার মতই, সঞ্চয় করবার মত নয়। বন্ধুরা তা মানেন না; কিন্তু এ কি তাঁদের প্রীতির জন্য? বিচারের ভার তাই পাঠকের উপর দিচ্ছি। ইতি—

৬।১০।৪৮ ইং লেখক

সংকলনটির সঙ্গে কোনো লেখক-পরিচিতি ছিল না। ছিল না কোনো সূচিপত্র। গল্পের সংখ্যা ছিল দশ। অধিকাংশ গল্পের সঙ্গে প্রকাশের বছরটি দেওয়া আছে কিন্তু কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই। কয়েকটি গল্পের সঙ্গে প্রকাশকালও প্রদত্ত নেই। গবেষকদের চেষ্টায় কোন্ পত্রিকায় গল্পগুলি প্রকাশিত তা জানা গেছ। 'ধূলিকণা' সংকলনে নেই। এমন কিছু অপ্রকাশিত গল্পও গবেষকেরা উদ্ধার করতে পেরেছেন। 'ধূলিকণা' সংকলনের গল্পগুলি সহ গোপাল হালদারের রচিত গল্পের একটি তালিকা প্রথমে পাঠকদের জন্য উপস্থিত করা হল।

ধূলিকণা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গল্প—

১।	নদীর মায়া	১৩২৯ বঙ্গাব্দ
২।	কালের কোপ	১৩২৯ বঙ্গাব্দ
৩।	জয়ন্ত	অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ
৪।	তারকার জন্ম	সালের উল্লেখ নেই
৫।	প্রথম চাকরী	পৌষ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ
৬।	কাপড়ের পুঁটুলি	১৩৩৩ বঙ্গাব্দ
৭।	পারুল	ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ
৮।	খেয়াডুবি	সালের উল্লেখ নেই।
৯।	জেলের ফটক	সালের উল্লেখ নেই।
১০।	রাস্তার রাজা	সালের উল্লেখ নেই।

দেখা যাচ্ছে যে, গল্পগুলির প্রকাশ-বৎসর ছয়টি গল্পের ক্ষেত্রে উল্লিখিত থাকলেও কোথায় প্রকাশিত ও কোন মাসে প্রকাশিত তার কোনো তথ্য নেই। লেখকের কাছ থেকে

অনুসন্ধান করে শৈলেশ বিশ্বাস জেনেছিলেন—গল্পগুলি সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়। শৈলেশ বিশ্বাস গোপাল হালদারের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ—'গোপাল হালদার : কথাসাহিত্য' পুস্তক বিপণি থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। সংকলনভুক্ত দুটি গল্প পুরোনো 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকে দেখেছি। 'তারকার জন্ম' প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে; 'কালের কোপ'-এর প্রকাশ আরও আগে, 'প্রবাসী'র ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-এ। সংকলনে প্রদত্ত সালটি ভুল।

এছাড়াও 'ভারতবর্ষ' এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গোপাল হালদারের বেশ কয়েকটি গল্প যেগুলি কোনো সংকলনভুক্ত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড. শ্রীপ্রসূন ঘোষ কয়েকটি গল্প সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেই গল্পগুলির কালানুক্রমিক তালিকা—

১। শেষ চিঠি	ভারতবর্ষ	১৩২৮ বঙ্গাব্দ (ষাণ্মাসিক সূচি-তে আষাঢ়-অগ্রহায়ণ বলে উল্লিখিত।)
২। দুদিনের সহযাত্রী	ভারতবর্ষ	১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৌষ
৩। পয়লা আষাঢ়	ভারতবর্ষ	১৩২৯ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়
৪। বিপথে	ভারতবর্ষ	১৩৩০ বঙ্গাব্দ, চৈত্র

এগুলির মধ্যে 'শেষ চিঠি' এবং 'বিপথে' গল্পদুটি প্রফুল্ল হালদার ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

অনেক কাল পরে গোপাল হালদার আবার 'পরিচয়' পত্রিকায় গল্প লেখেন। সেগুলির তালিকা—

১। উপহার	পরিচয়	১৩৭১ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন
২। প্রথম অশ্রু	পরিচয়	১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র
৩। ঘেরাও ও ধরাও	পরিচয়	১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন
৪। অঘটন ঘটল	পরিচয়	১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র
৫। জিন্দাবাদ	পরিচয়	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র-আশ্বিন

গোপাল হালদার রচিত উনিশটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেল এযাবৎ। হয়তো আরও কিছু ছড়িয়ে আছে এই পত্রিকাগুলিতেই অথবা অন্য কোনো পত্রিকায়।

গোপাল হালদারের গল্প লেখার দুটি পর্যায় দেখতে পাই। প্রথম পর্যায় মোটের উপর ১৩২৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায়। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ১৯২১ থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গল্প লিখেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে এই পর্বটি 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত। কিন্তু দেখা যায়, 'কল্লোল', 'সংহতি', 'কালিকলম' পত্রিকায় তাঁর কোনো গল্প নেই। সমকালে কাশী থেকে প্রকাশিত

'উত্তরা' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৫) পত্রিকাতেও তিনি লেখেননি; ১৯২৭-এ প্রকাশিত 'বিচিত্রা'তেও প্রকাশিত হয়নি তাঁর লেখা। পরম্পরা অনুসারী দুটি পত্রিকা 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ'-ই তাঁর গল্প লেখার ক্ষেত্র ছিল। সেই পর্বে আধুনিকতার নিশান উড়িয়ে আবির্ভূত নতুন পত্রিকাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়নি গোপাল হালদারের। 'কল্লোল-সংহতি-কালিকলম'-এ একদিকে ছিল দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের সংকট ও যন্ত্রণার উদ্‌ঘাটন, অন্যদিকে ছিল মনস্তত্ত্বের নতুন ধারণাগুলির উপর দাঁড়ানো চিত্তের অন্তঃস্তলের স্বরূপ তুলে ধরবার আগ্রহ। সেখানে যৌনতা ও অন্তর্মগ্ন চিত্তের জটিল কূটগ্রন্থিকে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস ছিল যথেষ্ট। যৌনতা-মনস্তত্ত্বের সরাসরি উপস্থাপনা গোপাল হালদারের গল্পে কোনো সময়েই পাওয়া যায় না। যদিও তাঁর জাঠতুতো দাদা রঙিন হালদার ছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ রূপে খ্যাতির অধিকারী, পাটনা-প্রবাসী স্বনামধন্য অধ্যাপক। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অবশ্য তাঁর গল্পে আছে যা সব সাহিত্যেই স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পে যৌনতা-প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কারবারি গোপাল হালদার কোনোদিন ছিলেন না। তবে দরিদ্র, বঞ্চিত শ্রেণির জীবন ও সংগ্রামের চিত্র তাঁর গল্পে প্রথমাবধি আছে। তবু 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মনের সাহচর্য যে গড়ে উঠল না তার কারণ সম্ভবত তাঁর জীবনের এই পর্বটির দিকে তাকালে বোঝা যাবে।

জন্ম ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদ্‌গাঁও-এ; বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ নোয়াখালিতে। পিতা সতীকান্ত হালদার প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, বিদ্যানুরাগী। স্কুল জীবনেই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এবং 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গে গোপাল হালদারের পরিচয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৮-তে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে, আগিল্‌ভি হস্টেলে থেকে নগরজীবনের সান্নিধ্য লাভ যাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন 'ইনটেলেকচুয়াল বিউটি'। সেই সৌন্দর্য অনুভব করলেও সেই বিউটি-র উপর-পালিশ তাঁর মন থেকে বাংলার জনজীবনের শিকড় ছিন্ন করতে পারেনি। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স-সহ বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন ১৯২৪-এ। দেখা যাচ্ছে এই সময়েই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশ পেতে শুরু করেছে—১৯২১ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে। 'কল্লোল'-এর তখনও জন্ম হয়নি। মাঝখানে কিশোর বয়সের 'যুগান্তর' দলের সংস্পর্শ ছাড়িয়ে গোপাল হালদার বিশেষভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেসের আন্দোলনে। এই সংযোগ, রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থান এবং সেই সময় পর্যন্ত মফস্‌সলের ভদ্র-মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের রুচি ও মূল্যবোধের সংস্কার সঙ্গত ভাবেই 'কল্লোল পন্থী' হয়ে উঠতে পারেনি। কলকাতায় ইংরেজি ও বাংলাভাষার প্রবন্ধ ও গল্প লেখক রূপে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপিত হল 'ভারতবর্ষ', 'মডার্ন রিভিউ', 'ওয়েলফেয়ার' 'প্রবাসী'-র সঙ্গে। এই পত্রিকাগুলির গোষ্ঠীতেই ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, সুশীলকুমার দে, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার। সেই সঙ্গে ছিল কলেজ ও ছাত্রাবাসের বন্ধু সজনীকান্ত দাসের সান্নিধ্য। গোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি' (প্রকাশ ১৯২৪) পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম

ধূলিকণা

(গল্প সংকলন)

গোপাল হালদার

প্রোগ্রেসিভ্ ফোরাম
২৪।৩এ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

কলিগ্রাম লাইব্রেরী (মালদহ)
হইতে সুশীল বিশ্বাস
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রচ্ছদপট : মণীন্দ্র মিত্র
প্রথম মুদ্রণ
আশ্বিন, ১৩৫৫
অক্টোবর, ১৯৪৮

মূল্য—দুই টাকা

প্রিন্টার—
শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

সদস্য হয়ে উঠলেন। বাংলা সাহিত্যের এই পর্বের সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন—এই 'প্রবাসী' ও বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি'-র মণ্ডলী থেকে 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে যাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব।

সেই সঙ্গে গোপাল হালদার ক্রমেই জড়িয়ে পড়েছেন গবেষণায় ও সক্রিয় রাজনীতিতে। প্রবন্ধ লেখা ছাড়া সাহিত্য চর্চার পাটই একরকম তুলে দিলেন তিনি ১৯২৬-এর পর তখনকার মতো আর গল্প লেখেননি। আবার সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হলেন বন্দিদশার অবকাশে ১৯৩২-এর পর।

প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে দেখা যায় কখনও রোমান্টিক মনের বিষাদ-বিধুর ভাবাবেগ, কখনও সমাজ-বিন্যাসে শ্রেণি-সংঘাতের বাস্তবতা। 'ধূলিকণা' সংকলনের প্রথম গল্পটিকে সেন্টিমেন্টালই বলা যায়। দুই বন্ধু। লেখক এক বন্ধুর ভূমিকায় উত্তমপুরুষের কথনে উপস্থাপন করেছেন গল্পটি। এই করণ-কৌশল তাঁর অনেক গল্পেই দেখতে পাই। গল্পকথক তার বন্ধু তরণীকে বারবার অনুরোধ করে তার সঙ্গে ছুটি কাটাবার জন্য। কিন্তু তরণী প্রতি ছুটিতেই চলে যায় পদ্মাতীরের নির্জনতায়। বেশ কিছুকাল পরে এই আচরণের কারণ জানা যায়। সে আর একটি গল্প। কথক জানান তরণীর কাছ থেকে গল্পটি শুনেছেন তিনি। গল্পের ভেতর গল্প—এই পদ্ধতিটি তখন বেশ চালু ছিল বাংলা ছোটোগল্পে। পাশ্চাত্য ছোটোগল্পেও উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই পদ্ধতি খুবই দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত 'মণিহারা' ও ক্ষুধিত পাষাণ' মনে পড়বে। তরণী-র বন্ধু ছিল নরেশ। নরেশের সর্বতোসহায়তায় ও আত্মত্যাগে তরণীর লেখাপড়া ও প্রতিষ্ঠা। সেই নরেশ খালি ভাবত তার দেশের নদী পদ্মার কথা। আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হলে সে যেতে পারবে দেশে—পদ্মা দেখতে। নরেশ রোগে ভুগে মারা যায়। মৃত্যুকালে তরণীকে অনুরোধ করে তার হয়ে একবার পদ্মা দেখে আসতে। বন্ধুর শেষ অনুরোধ রাখতে গিয়ে পদ্মার বন্ধনে বাঁধা পড়ে তরণী। তার মনে হয়, তার চোখ দিয়ে—তার হৃদয় দিয়ে আর একজন শোষণ করে নিচ্ছে এই পদ্মানদী। প্রতি ছুটিতে পদ্মা দেখতে না গিয়ে তার উপায় নেই। আগেই বলেছি, সেন্টিমেন্টাল গল্প। কিন্তু তরুণ লেখকের এই গল্পে এমন একটা আবহ-কেন্দ্রিক অলৌকিকতার টান আছে যা মনের মধ্যে রেশ রেখে যায়। বর্ণনায় একটু অতিপ্রাকৃত মেশালেই হয়ে যেত ন্যাথানিয়েল হথর্ন কিংবা এডগার অ্যালান পো-র গল্প। কিন্তু সে ধরনের অলৌকিকতার প্রতি গোপাল হালদারের আগ্রহ ছিল না।

'কালের কোপ' গল্পটি একটু পরে লেখা ১৯২৫-এ। নিঃসন্দেহে একটি স্মরণযোগ্য গল্প। ঠিকমতো প্রচার পেলে এ গল্প চল্লিশের প্রগতি আন্দোলনের সম্পদ বলে গণ্য হতে পারত।

সময় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোনো কালখণ্ডই হতে পারে। লাঠিয়াল পোষা জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক যুগ। করালী নদীর দুই পারে সিংহবাবু ও রায়বাবুদের জমিদারি। সিংহবাবুদের লাঠিয়াল-সর্দার রমাই ঘোষ, অন্য পক্ষে রায়বাবুদের ভৈরব—যে

এক সময়ে ছিল রমাই-এর সাগরেদ। জমিদারদের রেষারেষিতে প্রাণ দেওয়া লাঠিয়ালদের জীবনের ট্র্যাজেডি এই গল্পে। রমাই মনিব-জমিদারকে বলে দিয়েছিল—ভৈরবকে সে ঠেকাবে কিন্তু প্রাণ নিতে পারবেন না—'সে আমার চেলা'। দুর্ভাগ্যজনক দুর্বিপাকে লড়াই-এ ভৈরবের আঘাতে মারা পড়ল রমাই-এর তরুণ পুত্র মাধাই। শোকে ক্ষিপ্ত রমাই আক্রমণ করল ভৈরব-কে। ভৈরবও চেষ্টা করেছিল প্রতি-আক্রমণ না করবার। কিন্তু বৃদ্ধ রমাই শেষ পর্যন্ত ভৈরবের মার ঠেকানোর প্রত্যাঘাতেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। লজ্জিত, নতমুখ ভৈরব ফিরে গেল বাড়িতে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অনেক লেখকই গল্প শেষ করতেন এখানেই। কিন্তু গোপাল হালদার তাঁর নিজস্ব লেখক-সত্তা চিনিয়ে দেন গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে। চলে গেছে অনেক দিন। জমিদারদের প্রতাপ আর নেই। করালী নদীর দুই তীরে দুটি গরিব গ্রাম। মাঝি-চাষি-জেলেদের বসতি। বাতাবরণে পূর্বপুরুষদের গল্প ভেসে বেড়ায়। এই পারের লক্ষ্মণ নাকি ভৈরব সর্দারের বংশধর। ওই পারের পাঁচ বছরের বিশু নাকি রমাই সর্দারের মেয়ের ঘরের কোনো প্রজন্মের নাতি। কিন্তু 'এপারে ওপারে আজ আর বিবাদ নেই।' বিবাহ সূত্রে স্থাপিত হয়েছে আত্মীয়তা। এক উৎসব শেষে লক্ষ্মণ গেল ওপারের লোকেদের নদীর তীরে এগিয়ে দিতে। কোলে পাঁচ বছরের বিশু। কিন্তু চোরাবালির গ্রাসে যখন লক্ষ্মণ তলিয়ে যেতে চলেছে তখন প্রাণপণে বিশুকে সে নিরাপত্তা বলয়ে ছুঁড়ে দিয়ে যায়।

গোপাল হালদার কালের বিবর্তনের পটভূমিকে সর্বদা স্মরণে রেখেছেন তাঁর লেখায়। ছয় খণ্ডে রচিত উপন্যাসমালা 'ভদ্রাসন' ভূমি-কেন্দ্রিক বঙ্গীয় সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস। এই উপন্যাসের প্রাক্ কথন যেন এই গল্পটি। এই গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সমপর্যায়ে সংরক্ষিত। জমিদার ও প্রান্তিক মানুষ—এই দুই শ্রেণিকে অনায়াস মুঠিতে ধরেছেন দু-জনেই। তবে মনে রাখতেই হবে গোপাল হালদার এই ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের পূর্বসূরি। করালী নদীর তীরস্থ নিসর্গ পরিমণ্ডলও তারাশঙ্করকে মনে করিয়ে দেয়। এই গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের ঐক্যবদ্ধ জীবন-সংগ্রামের চিত্র আছে। সামন্ততন্ত্রের অবসানের কথা আছে। অথচ প্রগতি আন্দোলনের পর্ব বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল আরও এক দশক পরে।

'খেয়াডুবি' আরও একটি আশ্চর্য গল্প। এখানেও কথকের ভাষ্যে উপস্থাপিত গল্পটি। পদ্মা-মেঘনা ও সমুদ্র-মোহনার নিকটবর্তী জলপথে চলে চোরা আফিমের কারবার। গল্পের কথক সেখানকার দারোগা। মনে পড়ে যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়াঁর কারবারের কথা। তবে মানিকের উপন্যাসটি অন্তত দশ বছর পরে লেখা। এখানে গোপাল হালদার কোনোভাবেই 'রোমান্টিসাইজ' করেননি এই জলজীবী সমাজকে। মাঝি ও জেলেদের কথাও একটু আছে। লেখক তাদের জীবন-সত্যকেই তুলে ধরেছেন। ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রামের পাশাপাশি আছে যৌবন-বাসনা ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র উদ্‌ঘাটন। সন্দ্বীপ অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে চোরা-চালানের যে আমদানি-রফ্‌তানি ব্রহ্মদেশের উপকূল থেকে চট্টগ্রাম হয়ে

খিদিরপুর পর্যন্ত ছড়ানো তার চমৎকার উদ্‌ঘাটন এই গল্পে। জলজীবিকার অঙ্গ মাছ ধরা ও খেয়া বাওয়া ছাড়াও এই চোরা চালান—এই বাস্তব লেখ আমাদের দেখিয়ে দেন। নৌকো জলমগ্ন। তিনদিন ধরে জলে ডুবে থাকা তিনটি লোককে উদ্ধার করা হয়েছে।—"আমি আস্তে আস্তে সেই দেহ কয়টির মুখের দিকে তাকাইলাম। একেবারে সাদা—যেন বরফের নীচে কতকাল ইহাদের পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল। দুই জনের মুখে ঘনকালো দাড়ি ছিল, আর একটির তখনো ভালো করিয়া দাড়ি উঠে নাই। সেই কালো দাড়ির মধ্যে ফ্যাকাসে মুখ যে কি বিকট তাহা কল্পনাও করা যায় না।" দুটি লোক মারা গেল। আর একজনকে আবগারি অফিসার ব্রান্ডি খাইয়ে কথা বলার অবস্থায় আনলেন। সেই কাদের মিঞা—আফিম কারবারের 'বড় পাণ্ডা'। কিন্তু এই গল্পে লেখক মেয়ে আমিনার জন্য কাদেরের ব্যাকুলতা, সদ্যোমৃত জামাই মকবুলের জন্য তার বেদনাকে ফুটিয়েছেন। সেই সঙ্গে চোরা কারবারের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিশ্লেষিত হয়েছে গোয়েন্দা গল্পের মতো অথবা পুলিশি রির্পোট-এর মতো করে। পুলিশের ঘুষ নেবার ছবিও বাদ যায়নি। বন্যার এবং মানুষ ও জলের সংগ্রামের বিবরণ তিন পৃষ্ঠা জুড়ে লেখক দিয়েছেন। তার চলচ্চিত্ররূপ দিলে বাংলা সিনেমার 'টাইটানিক' হয়ে যেত। হেমিং ওয়ে-র 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি' (১৯৫২) লেখা হয়েছে আরও পঁচিশ বছর পরে অন্তত। সেই সঙ্গে মিশেছে জলজীবী পুরুষদের ঘরের নারীর কান্না।

আছে আরও বিভিন্ন ধরনের গল্প। 'কাপড়ের পুঁটুলি' গল্পে বাংলার গ্রামের মেয়েদের স্বাভাবিক প্রাণের স্ফূর্তি হারিয়ে যায় বাল্যবিবাহে। চনমনে মেয়েগুলি পরিণত হয় কাপড়ের পুঁটলিতে। এই গল্পটি বাঙালি মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনে এখন আর তেমন সত্য নেই। কিন্তু এখনও প্রায়ই খবর হয়—নাবালিকা মেয়েদের বিবাহ 'রুখে দেওয়া' হয়েছে। যখন ভাবি—রুখে দেওয়ার ঘটনাগুলিই কাগজে বেরোয়। না-রুখে যাওয়া বিবাহগুলিতে এই মেয়েরা কাপড়ের পুঁটলি নয়, যৌন-পণ্যে পরিণত হয়। তখন এই গল্পটিকে প্রাসঙ্গিকের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক লাগে।

একটু অন্য স্বাদের গল্প 'পারুল'। গ্রামের খ্রিস্টান পাদ্রি স্কুল খুলেছিলেন ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে সাতটি ছেলে ভর্তি হল। তাদের বন্ধু হয়ে উঠল পাদ্রির বালিকা কন্যা ভায়োলেট। বালকবেলার হাসি-দুঃখ, ভাব-ঝগড়ায় দিন কাটে। সমাজের নিন্দা-মন্দও পিছু ছাড়ে না। তারপর সবাই বড়ো হয়। ভায়োলেট, যার নাম ছেলেরা দিয়েছিল সাতভাই চম্পার বোন পারুল—ঘর ছেড়ে যায় এক যুবকের আকর্ষণে। অনেকদিন পরে কথক যুবকের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল একাকিনী পারুলের। ঘরে এসে সে দেখতে থাকে ছোটোবেলায় তোলা একটি গ্রুপ ফটো। সাতটি বালকের সঙ্গে তাদের একমাত্র বালিকা বান্ধবী ভায়োলেট—পারুল। আমরা কি সুবোধ ঘোষের 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পটি মনে করতে পারি? মিল নেই, তবু মিল আছে—আবহ নির্মাণে, চরিত্রায়ণে একটু। সুবোধ ঘোষ এই ধরনের পরিবেশের কথা ভেবেছিলেন গোপাল হালদারের কত কাল পরে!

একটি গল্পে অবশ্য গোপাল হালদারকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুজ লেখক বলে মানতেই হয়। 'প্রথম চাকরী' গল্পটি এক পোস্টমাস্টারের কীর্তি-কথা। গ্রামের মানুষের সারল্য ও নিরক্ষরতার সুযোগে তার দুষ্কার্যের খতিয়ান। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পোস্ট মাস্টারও এ ভাবেই লোক ঠকাত।

'জয়ন্ত' গল্পটি এক বিপ্লবী যুবকের আদর্শ ও অভিজ্ঞতার কথারূপ। যখন ১৯৪৮-এ 'ধূলিকণা' সংকলনটি প্রকাশিত হয়, তখন লেখক গল্পের শেষে একটি টীকা জুড়েছিলেন।—

"এ গল্পটি বছর পঁচিশ আগেকার লেখা, বছর চব্বিশ আগে যখন 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় তখন সম্পাদকীয় বিভাগ গল্পটি সমাপ্ত করেন এই কথাটুকু যোগ করে। 'কিন্তু এই পাতাগুলোর মধ্যে জয়ন্তের কথা যাই থাক বা না-থাক, এতে এমন অনেক জিনিস আছে যাতে টিকটিকি পুলিশের হাতে আমি নির্য্যাতন সইতে পারি। তাই, এগুলো অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলাই ঠিক করেছি।' এইটুকু লেখকের রচনা নয়, সম্পাদকের সাফাই। চব্বিশ বৎসর আগে বাঙলা দেশের মাসিক পত্রকে কতটা শঙ্কিত পদে চলতে হত। আর—লেখকদের তাই চলতে হত এরূপ সন্দেহের পথ থেকে দূরে দূরে। এই কথা কয়টি তারই এক টুকরো ঐতিহাসিক প্রমাণ। লেখক, ১৩৫৩।"

'একটি তারকার জন্ম'—এক অচরিতার্থ প্রেমের আখ্যান। সুলিখিত কিন্তু ভাবাবেগ প্রধান। উল্লেখযোগ্য গল্প 'জেলের ফটক'। এই গল্পে রাজনৈতিক প্রশাসন, প্রশাসকদের সঙ্গে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের আঁতাত এবং গরিব মানুষের সর্বতোবঞ্চিত পরিস্থিতির কথা লিখেছেন লেখক। করিম গিয়েছিল ধনী প্রতিবেশীর পুকুর থেকে রাতের অন্ধকারে কয়েকটি মাছ চুরি করবার জন্য। কিন্তু কাদের মিঞা তাকে ধরে ফেলবার পর আদালতে বললেন যে, করিম তাঁর অন্তঃপুরে ঢুকেছিল তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে অসদাচার করবার জন্য। বিচারক সব বুঝেও করিমকে তিন বছরের জেলের সাজা দিলেন। জেলে থাকা অবস্থায় শুরু হয়েছিল গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন। অনেক গান্ধীপন্থী জেলে এসে ঢুকেছিলেন। তাঁদের দেখে সরল-বুদ্ধি করিমের মনে হয়েছিল যে, গান্ধী মহারাজের চ্যালারা ভালো লোক। জেল থেকে বেরিয়ে নিজের মহল্লায় গিয়ে করিম দেখল কাদের মিঞা তখন কংগ্রেসের নেতা। জেল ফেরত আসামি করিমকে কেউ কাজ দিল না। গরিব ছিঁচকে চোর করিম—তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, উদ্‌ভ্রান্ত—রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল একা। সে শাসকদের কেউ নয়, স্বদেশিদেরও কেউ নয়। হয়তো এই সময় থেকেই রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারাচ্ছিলেন গোপাল হালদার।

'ধূলিকণা'-র আলোচনা শেষ করব শেষ গল্প 'রাস্তার রাজা' দিয়ে। 'রাজা' একটি কুকুর। তার নাম দিয়েছিল রাস্তার এক পাগল। নিজের কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোগাড় করা খাবার থেকেই রাজাকে সে ভাগ দিত। রাজা মানুষ চিনত, মানুষের গায়ের গন্ধ চিনত; মানুষের ধর্ম আর সম্প্রদায় চিনত না। নিজেদের কুকুর-সমাজ; তরুণী কুকুরী-র সান্নিধ্যের জন্য অধিকারের লড়াই আর পালক পাগলার যত্নে ভালোই ছিল সে। কিন্তু লেগে গেল হিন্দু-

মুসলমানে দাঙ্গা। ইট-পাটকেল-লাঠি-ছুরি-পুলিশের গাড়ি। রক্তস্রোত-লাভা। শুনশান রাস্তা। বিভ্রান্ত, ব্যাকুল রাজা খুঁজে বেড়ায় পাগলকে, খোঁজে চেনা গায়ের গন্ধ। পায় না। দাঙ্গায় সব গন্ধ মিশে গেছে। এই গল্পটিকেও যথোচিত সম্মান দিয়ে আমরা কি রাখব না—সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা', রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', সমরেশ বসুর 'আদাব'-এর পাশে?

এই গল্পটি ঠিক কোন সময়ে রচিত তা উল্লিখিত নেই। দাঙ্গার পটভূমি বলে অনেক গবেষক অনুমান করেছেন যে, গল্পটি চারের দশকের কোনো সময়ে লেখা। হতেই পারে। দাঙ্গা বললেই আমাদের ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথাই মনে পড়ে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাংলায় আগেও আরও ঘটেছে। বিশেষ করে ১৯২৬-এর দাঙ্গার অভিজ্ঞতা কবিতায় লিপিবদ্ধ রেখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই গল্পটি সেই স্মৃতিও বহন করতে পরে। যদি ১৯৪৬-এ লেখা হত তাহলে কি ১৯৪৮-এ 'ধূলিকণা' সংকলিত হবার সময়ে রচনাকাল উল্লেখ করতেন না লেখক? 'ধূলিকণা' সংকলনের গল্পগুলির লিখন-কাল, তাঁরই উক্তি অনুসারে অধিকাংশই ১৯২১ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে।

পরবর্তী পর্যায়ে যখন 'পরিচয়' পত্রিকায় গল্প লিখেছেন গোপাল হালদার তখন সমকালীন জীবন, ছাত্র-আন্দোলনের ও শ্রমিক-আন্দোলনের পটভূমিতে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র; রাজনীতির প্রেক্ষাপট কিছুটা এসেছে গল্পে। এই চরিত্রগুলিকে গোপাল হালদার খুব ভিতর থেকে চিনতেন না। তাঁর যুগের রাজনীতি-করা মানুষেরা তখন আর নেই। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির উপর আধুনিকতা একটু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাহেবিয়ানার ছবি হয়েছে খুবই কৃত্রিম। শেইলা গুপ্তা নামের সিগারেট টানা উগ্র আধুনিকা মেয়েটি যে প্রকৃতপক্ষে কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী—সে-কথাটাই লেখক বলেছেন কিন্তু সেই বিবরণ থেকে গেছে অনেকটাই সাজানো। এই সময়ের পার্টি-পলিটিক্স্-এর চরিত্রও অনেকখানি আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে। গল্পকার গোপাল হালদারের শিল্প প্রতিভা অনুভব করা যায় প্রথম পর্বের গল্পেই।

তবে এখানেও ১৯৬৮-র 'পরিচয়' পত্রিকায় 'অঘটন ঘটল' গল্পের কেন্দ্রে আছে একটি নেড়ি কুত্তা—বাঞ্ছা। তার এবং আশ্রয়দাত্রী তরুণী রূপার গল্প। দু-জনকেই পরিবারে বহু হেনস্থা সহ্য করতে হয়। রূপা ও বাঞ্ছাকে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন মানুষের সমাজে যতটা শ্রেণিভেদ আছে, কুকুরের সমাজে ততটা নেই। শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছার সঙ্গেই রূপা তার পরিবারের নিরাশ্রয়তা থেকে পৌঁছয় তার প্রণয়ীর আশ্রয়ে। প্লট একটু সাজানো হলেও হৃদয়-স্পর্শী রচনা।

আর একটা দিক দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। দুই পর্বেই নারী-সমাজের প্রতি লেখকের সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট। বিশেষত 'বিপথে' গল্পটিতে নারীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের সংঘাত ও নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারের বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে। বোঝা যায়, তিনি বাঙালি সমাজের সেই যুগের মানুষ যখন নারীর প্রতি স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ (শিভ্যালরি) বাঙালি পুরুষকে ছেড়ে যায়নি।

'জিন্দাবাদ' গল্পটিতে বামপন্থী দলের তরুণ-তরুণীদের ছবি আছে। প্রেমের মধুর পরিণামে বিপত্তি কাটিয়ে পার্টি-কর্মী প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হল মেয়েটি। এ-গল্প ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের। সময়ের পক্ষে গল্পটি কিছু অন্-আধুনিক। তবে লেখকের মন চেনা যায়।

দুটি পর্ব মিলিয়ে গোপাল হালদারের গল্পকার পরিচয়টি বিভিন্ন দিক থেকে আগ্রহ-উদ্দীপক। শিল্পশৈলীর দিক থেকে, বিষয়-বস্তু ও সময়পটের দিক থেকে, লেখকের মানস-প্রবণতার দিক থেকে তাঁকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে—স্বল্প পরিসর এই নিবন্ধে তার সমগ্র পরিচয় দেওয়া গেল না। রূপরেখাটি সাধ্যমতো তৈরি হল মাত্র।

কিন্তু গোপাল হালদারের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আমরা তখনই নিবেদন করতে পারব যখন তাঁর একটি গল্প-সমগ্র প্রকাশিত হবে আমাদের প্রচেষ্টায়।